সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক প্রত্যয়
Basic Concepts of Sociology

ইউনিট ৪

প্রতিটি শাস্ত্রেরই নিজস্ব কিছু মৌলিক প্রত্যয় রয়েছে। এসব প্রত্যয়কে কেন্দ্র করেই শাস্ত্রটি আবর্তিত হয়। অর্থনীতির মৌলিক প্রত্যয় হচ্ছে সম্পদ, উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন, মালিকানা, বাজার ব্যবস্থা ইত্যাদি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মৌলিক প্রত্যয়সমূহের মধ্যে রাষ্ট্র, রাজনীতি, সরকার, নেতৃত্ব ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একইভাবে শাস্ত্র হিসেবে সমাজবিজ্ঞানেরও কিছু মৌলিক প্রত্যয় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে সমাজ, সম্প্রদায়, দল বা গোষ্ঠী, সংঘ, প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি, সভ্যতা ইত্যাদি। এসব প্রত্যয়কে ঘিরেই সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা আবর্তিত হয়। এ ইউনিটে সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক প্রত্যয়সমূহ আলোচনা করা হল।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৬ দিন

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১: সমাজ ও সম্প্রদায়
পাঠ-৪.২: দল
পাঠ-৪.৩: প্রতিষ্ঠান ও সংঘ
পাঠ-৪.৪ : সংস্কৃতি ও সভ্যতা
পাঠ-৪.৫ : সম াজকাঠামো
পাঠ-৪.৬ : প্রথা, লোকাচার ও লোকরীতি

পাঠ-৪.১ সমাজ
Society

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজ বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখতে পারবেন;

মুখ্য শব্দ	সমাজ, সামাজিক সম্পর্ক, সহযোগিতা, নির্ভরশীলতা।

সমাজ (Society)

সমাজবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে 'সমাজ'। তাই সমাজ বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের সুনির্দিষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে গিয়ে সমাজ সৃষ্টি করেছে। মানুষ নিজের প্রয়োজনেই সমাজের সৃষ্টি করেছে। সেজন্য সমাজে বাস করতে হলে মানুষকে সামাজিক নিয়ম-কানুন রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। যখন কোনো মানুষ সমাজের আইন-কানুন, মূল্যবোধ, বিশ্বাস মেনে চলেনা তখন সে সমাজের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হয়। বিভিন্ন দেশে সমাজের মূল্যবোধগত পার্থক্য থাকতে পারে। তবে প্রতিটি সমাজে কতগুলো সাধারণ নিয়ম-কানুন রয়েছে, যা সবাইকে মেনে চলতে হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।
সাধারণত সমাজ বলতে পারস্পরিক সম্পর্কে বাঝায়।

সমাজবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সমাজ। শিশু জন্ম থেকে আমৃত্যু সমাজেই বাস করে, সমাজই শিশুকে সামাজিকতা শিক্ষা দেয়। সমাজের সৃষ্টিও মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য হয়েছে। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের মাঝেই মানুষ তার কর্মদক্ষতাকে প্রকাশ করে এবং প্রয়োজনাদি মিটিয়ে থাকে। আবার প্রয়োজনে সমাজকে নিয়ন্ত্রণও করে। কেননা নিয়ন্ত্রণহীন সমাজ মানুষের কাম্য নয়।

সমাজের সর্বজনস্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সমাজকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।
সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ তাদের 'Society' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "Society is a system of social relationships in and through which we live." অর্থাৎ সমাজ হচ্ছে এমন সব সমাজিক সম্পর্কের একটি ব্যবস্থা যার মধ্যে আমরা জীবন যাপন করি। তিনি সমাজ বলতে সামাজিক সম্পর্কের জটিল জালকে বুঝিয়েছেন।

গিডিংস (Giddings) বলেন, "সমাজ হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত একটি সচেতন মানবগোষ্ঠী যেখানে তাদের পারস্পরিক সচেতন আলোচনা একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্কে পর্যবসিত হয় এবং কালক্রমে তা একটি স্থায়ী ও জটিল সংগঠনে দৃঢ়বদ্ধ হয়।"

জিসবার্ট বলেন: "Society, in general, consists in the complicated network of social relationship by which every human being is interconneted with his fellowmen." অর্থাৎ "সাধারণভাবে সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের এমন একটি জটিল জাল যার মাধ্যমে প্রত্যেকটি মানুষ তার সঙ্গীদের সাথে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ।"

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য, আবশ্যকীয় বস্তু সংগ্রহের প্রয়োজনে, জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এবং শিক্ষা ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত যে সংগঠনের উপর নির্ভরশীল তা হচ্ছে সমাজ। বস্তুত মানুষ বেঁচে থাকার জন্য একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। আর এই নির্ভরশীলতা থেকেই সৃষ্টি হয় মিথস্ক্রিয়া। মিথস্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় সামাজিক সম্পর্ক এবং পরিশেষে গড়ে উঠে সমাজ।

সমাজের গঠন প্রক্রিয়াকে নিম্নরূপভাবে দেখানো যায়:

নির্ভরশীলতা → মিথস্ক্রিয়া → সামাজিক সম্পর্ক → সমাজ

সমাজের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Society)

সমাজ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পাই:

১। সমাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংঘবদ্ধতা;
২। সমাজ বলতে সমাজে বসবাসরত মানুষের পারস্পরিক কার্যাবলিকে বুঝায়;
৩। সামাজিক বন্ধন ও সামাজিক সংহতি সমাজের মূল কথা;
৪। সমাজ শব্দটি এমন একটি বিমূর্ত ধারণা প্রকাশ করে যাকে অনুভব করা যায়;
৫। সমাজ হচ্ছে সহযোগিতার সর্বোত্তম ক্ষেত্র;
৬। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই সমাজ গড়ে ওঠে;
৭। সমাজ অনুভূতিক্ষম সমজাতীয় বুদ্ধিমানপ্রাণির সমষ্টি;
৮। সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক সর্বদা পরিবর্তনশীল।
৯। সমাজে প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিরোধ পরিলক্ষিত হয়;
১০। সমাজে সামাজিক অসমতা, স্তরবিন্যাস ও শ্রেণি সম্পর্ক রয়েছে;
১১। সমাজ ব্যাপক অর্থে (বাঙালি সমাজ) এবং সীমিত অর্থে (নারীসমাজ, লেখক সমাজ) বিরাজমান;
১২। সমাজে বসবাসরত মানুষের একটি অতীত ঐতিহ্য থাকে;
১৩। সমাজ মানুষের সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল।
১৪। সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে সংস্কৃতি, ধর্ম এবং জীবন প্রণালী ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু একত্রে বাস করার ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।	**সময়: ০৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রাথমিক প্রত্যয়সমূহের মধ্যে সমাজ গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ হচ্ছে এমন একটি সংগঠন যা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং যার ভিত্তি হচ্ছে পারস্পরিক সম্পর্ক। অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্কের এক জটিল জালে আবদ্ধ জনগোষ্ঠীকেই সমাজ বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'সমাজ' সৃষ্টির প্রক্রিয়া কোনটি?
(ক) সামাজিক সম্পর্ক - নির্ভরশীলতা- মিথষ্ক্রিয়া - সমাজ।
(খ) মিথষ্ক্রিয়া - নির্ভরশীলতা-সামাজিক সম্পর্ক-সমাজ।
(গ) নির্ভরশীলতা - মিথষ্ক্রিয়া-সামাজিক সম্পর্ক-সমাজ।
(ঘ) সমাজ-সামাজিক সম্পর্ক - নির্ভরশীলতা মিথষ্ক্রিয়া।

২। সমাজ সৃষ্টি হয় -
(ক) মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানের সমন্বয়ে
(খ) মানুষের নিজের জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে
(গ) বন্যজন্তুর আক্রমণের আশংকা থেকে দলবদ্ধ হয়ে
(ঘ) প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে

পাঠ-৪.২ সম্প্রদায়
Community

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন;
- গ্রামীণ ও শহুরে সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সম্প্রদায়।

সম্প্রদায় (Community)

সমাজবিজ্ঞানে সমাজের পরেই যে প্রাথমিক প্রত্যয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয় তা হলো 'সম্প্রদায়'। 'সম্প্রদায়' হচ্ছে অভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি পালনে অভ্যস্ত জনসমষ্টি যেখানে জীবনের সামগ্রিক প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হয়। মানুষ তার প্রয়োজনেই সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে শিখেছে। সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। তাই সম্প্রদায় বলতে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী জনসমষ্টিকে বুঝায়, যারা অভিন্ন রীতিনীতি অনুসরণের মাধ্যমে জীবনযাপন করে।

সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা সুনির্দিষ্ট আচরণের ভিত্তিতে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সম্প্রদায় হচ্ছে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে সমাজের একটি বৃহত্তর গোষ্ঠী কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস এবং অভিন্ন মানসিকতা ধারণ করে। সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন সম্ভব। সম্প্রদায়ের সদস্যরা সুস্পষ্ট সামাজিক সংহতি অনুভব করে এবং অভিন্ন জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত।

সম্প্রদায়ের সংজ্ঞায় সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, "Whenever the members of any group, small or large, live together in such a way that they share, not this or that particular interest but the basic conditions of common life called that group a community." যখনই কোনো ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর লোকেরা এমনভাবে একত্রে বসবাস করে তারা বিশেষ কোনো স্বার্থের অনুসারী না হয়ে বরং অভিন্ন জীবনের অংশীদার হয়ে বসবাস করে আমরা তখনই ঐ জনগোষ্ঠীকে একটি সম্প্রদায় বলি।

সমাজবিজ্ঞানী কিংসলে ডেভিস সম্প্রদায়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন "সম্পদ্রায় হল একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বা স্থানের জনগোষ্ঠী যারা সকলেই একই সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলে"।

সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ণ ও নিমকফ সম্প্রদায় বলতে এক বা একাধিক গোষ্ঠীর সমষ্টিকে বুঝিয়েছেন- যারা একই এলাকায় বাস করে (Community is a group or a collection of groups that inhabits a locality)। অগবার্ণ ও নিমকফের মতে, অভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী জনসমষ্টি অন্য এলাকার একটি জনসমষ্টি থেকে পৃথক। তদুপরি সম্প্রদায়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, অভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান সংগঠিত জীবন প্রণালী।

সমাজবিজ্ঞানী পার্ক ও বার্জেস বলেন "সম্প্রদায় বলতে এমন একটি আঞ্চলিক জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি, ভাবধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এক ও অভিন্ন"।

অতএব, সম্প্রদায় বলতে এমন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা কোনো বিশেষ স্বার্থের জন্য কাজ না করে বরং একটি অভিন্ন জীবনযাত্রার অংশীদার হয়ে একত্রে বসবাস করে। সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা অভিন্ন সংস্কৃতি ও সুনির্দিষ্ট আচার আচরণের ভিত্তিতে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Community)

সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর সদস্যদের অভিন্ন জীবন-যাপন প্রণালী ও মানসিকতা। একজন মানুষের সমগ্র জীবন একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই অতিবাহিত হয়। কোনো ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গোষ্ঠীর সদস্যরা যেখানেই বসবাস করুক না কেনো একত্রে বসবাস করতে গিয়ে তারা জীবনের মৌলিক এবং সাধারণ স্বার্থগুলো একইসাথে ভোগ করে। এভাবেই গড়ে ওঠে সম্প্রদায়। সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে একজন ব্যক্তির পরিপূর্ণ সামাজিক জীবন প্রতিফলিত হয়। ম্যাকাইভার ও পেজের মতে সম্প্রদায়ের ভিত্তি হল দুটি। যথা ঃ-

১। বসবাসের অঞ্চল (Locality)

২। সম্প্রদায়গত চেতনা (Community sentiment)

১। **বসবাসের অঞ্চলঃ** যেকোনো সম্প্রদায় সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে থাকে। সম্প্রদায়ের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের গুরুত্ব লক্ষ করা যায়। ভৌগোলিক পরিবেশের ক্ষেত্রে তারতম্যের জন্য মানুষের জীবনযাত্রায়ও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় দীর্ঘকাল বসবাসকালে মানুষের দৈহিক, মানসিক ও আচার-আচরণ, রীতিনীতি ইত্যাদিতে একটা সামঞ্জস্য গড়ে ওঠে। এই সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। যেমন - এস্কিমো সম্প্রদায়, গ্রাম সম্প্রদায়, পাহাড়ী সম্প্রদায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত।

২। **সম্প্রদায়গত চেতনাঃ** একটি সম্প্রদায়ভুক্ত সকল সদস্যের একসাথে বসবাস করার মানসিকতা থাকতে হবে। একই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সংহতিবোধ খুবই প্রবল এবং তারা সবাই পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সচেতন। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সম্প্রদায়গত অনুভূতিই একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি, পারস্পরিক সম্পর্ক ও সচেতনতার পরিচায়ক। বস্তুত, একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভাবগত, আচরণগত এবং রীতিনীতিগত বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এছাড়াও সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবে সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সাদৃশ্য, ঐতিহ্য, নৈকট্য ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রদায়ের ধরন (Types of Community)

সম্প্রদায় ছোট হতে পারে, আবার বড়ও হতে পারে। উভয় ধরনের সম্প্রদায়ই মানুষের প্রয়োজন। তবে বৃহত্তর সম্প্রদায় ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে কখনো কখনো বিলীন করে দিতে পারে। ব্যাপক অর্থে সম্প্রদায়ের দু'টি ধরন রয়েছে। যথা:

১। গ্রামীণ সম্প্রদায়

২। শহুরে সম্প্রদায়

গ্রামীণ সম্প্রদায়ঃ গ্রামীণ সম্প্রদায় হচ্ছে এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা একই ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করে এবং যাদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি ও সম্পর্ক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও নিবিড়। আদিম কৃষিভিত্তিক জীবনব্যবস্থা থেকেই গ্রামীণ বসতি গড়ে উঠেছে। যেসব এলাকায় গ্রামীণ বসতি গড়ে উঠেছে সেসব এলাকার সুনির্দিষ্ট নাম ও সীমারেখা রয়েছে। তবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আচার–আচরণ ও জীবনব্যবস্থা নগরের জনগোষ্ঠীর আচার আচরণ ও জীবনধারা থেকে ভিন্ন। নিম্নে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হল-

১। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সকলের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে।

২। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের প্রধান পেশা সাধারণত কৃষি। এছাড়া পশুপালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা সনাতন পেশাও পরিলক্ষিত হয়।

৩। সাধারণত গ্রামীণ সম্প্রদায়ের লোকজন রক্ষণশীল থাকে এবং ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের প্রতি অধিকার শ্রদ্ধাশীল।

৪। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ভেতর সামাজিক গতিশীলতা কম। এখানে সামাজিক পদমর্যাদার গুরুত্ব বেশি।

৫। গ্রামীণ সম্প্রদায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্রকায়। কারণ গ্রামগুলোর ক্ষুদ্র আয়তনের জন্য গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলো ক্ষুদ্র হয়।

৬। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের লোকজন সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির প্রতি গভীর আস্থাশীল এবং মেনে চলে ।

৭। গ্রামীণ সম্প্রদায়ে অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে কঠোর।

শহুরে সম্প্রদায়ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে এবং আর্থ-সামাজিক কারণে গ্রামের মানুষ শহরে বসতি স্থাপন করে। শহর জীবনে রয়েছে বৈচিত্র্য। এখানে সাধারণত কৃষিবহির্ভুত পেশার আধিক্য রয়েছে। সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, সংস্কৃতি ও বিনোদন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে ওঠে। শহুরে সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

১। শহুরে শিক্ষার সুযোগ বেশি। এখানে বিচিত্র সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিলক্ষিত হয়।

২। শহুরে সম্প্রদায়ের সামাজিক পরিবেশ উন্নত এবং আধুনিক বিশ্বের অগ্রগতির সাথে তাদের জীবন ধারা সম্পৃক্ত।
৩। শহুরে সম্প্রদায়ের মধ্যে একক পরিবারের আধিক্য লক্ষ করা যায়।
৪। শহুরে সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক গতিশীলতা বেশি।
৫। শহুরে সম্প্রদায় শিল্পোৎপাদন এবং বৃত্তিমূলক পেশায় বেশি নিয়োজিত।
৬। শহুরে সম্প্রদায়ের লোকজন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী এবং তারা অনেকটা কুসংস্কার মুক্ত।
৭। শহুরে সম্প্রদায় অর্থনৈতিক কার্যক্রমে বেশি গতিশীল, চিন্তা-চেতনায় অধিকতর প্রগতিশীল হয়।

সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য

নিম্নে সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যসূচক কতকগুলো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল:

১। **উদ্দেশ্য:** সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করা, যেমন- ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানার্জন। পক্ষান্তরে সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ বিভিন্ন পেশা ও জীবন যাত্রার অধিকারী, যেমন- একটি গ্রামে বিভিন্ন পেশা ও জীবন যাত্রার লোক থাকতে পারে। তবু তারা একটি সম্প্রদায়।

২। **আদর্শ:** সমাজস্থ মানুষ বিভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী হতে পারে। যেমন - শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে কেউ ধনতন্ত্রে বিশ্বাসী হতে পারে, আবার কেউ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে, সম্প্রদায়গত জীবন ধারনের আদর্শ ও রীতিনীতি এক ও অভিন্ন।

৩। **অঞ্চল:** 'সমাজ' এর জন্য জনসমষ্টির একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের প্রয়োজন নাই। যেমন- ছাত্র সমাজ, কিন্তু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে জনসমষ্টিকে অবশ্যই নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের বাসিন্দা হতে হবে। যেমন- একটি গ্রামীণ সম্প্রদায়, শহুরে সম্প্রদায়, উপজাতীয় সম্প্রদায়, পাহাড়ী সম্প্রদায় ইত্যাদি।

৪। **সম্প্রদায়গত মনোভাব:** সমাজের জন্য সম্প্রদায়গত মনোভাব কিংবা ঐক্য অপরিহার্য নয়। কিন্তু সম্প্রদায়ের জন্য এটি একটি অপরিহার্য দিক।

৫। **গঠন প্রকৃতি:** সমাজ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা গড়ে উঠে। আর সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠে।

৬। **পারস্পরিক সম্পর্ক:** সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্পর্ক অপরিহার্য। সমাজে প্রত্যেকেই একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, সম্প্রদায় হচ্ছে জীবন যাপনের একটি বৃত্ত বিশেষ। এখানে সকল সদস্যকে অভিন্ন রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। এখানে সুষ্ঠু জীবন যাত্রার সব কিছুই সমষ্টির উপর নির্ভরশীল।

৭। **অধিকার:** একটি সমাজে সব ধরনের মানুষ বসবাস করতে পারে। কিন্তু একটি সম্প্রদায়ে সব ধরনের মানুষ সাধারণত বাস করতে পারে না। কারণ সমাজের চেয়ে সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে কঠোর রীতিনীতি ও প্রথা–পদ্ধতি বিদ্যমান থাকে।

৮। **অংশীদারীত্ব:** একটি সমাজে দুই বা ততোধিক সম্প্রদায় থাকতে পারে, কিন্তু একটি সম্প্রদায়ে দুই বা ততোধিক সমাজ থাকতে পারে না।

৯। **নির্ভরশীলতা:** সমাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন যাপনের কোন সংস্থা নয়। কিন্তু সম্প্রদায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে। যেমন, প্রাক–ব্রিটিশ যুগের ভারতীয় গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র বলে গণ্য করা হত।

১০। **রীতিনীতি:** সমাজ হচ্ছে মানুষের সৃষ্ট কতকগুলো রীতিনীতি দ্বারা গড়ে উঠা একটি ব্যবস্থা - যার মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষ পারস্পরিক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। আর সম্প্রদায় হচ্ছে অভিন্ন রীতিনীতি সমন্বিত একটি জনসমষ্টি, যারা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সম্প্রদায়ের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।	**সময়: ০৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

যখন কোনো ছোট বা বড় জনসমষ্টি একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে অভিন্ন স্বার্থ ও অনুভূতি, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি অনুসরণ করে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন করে তখন তাকে সম্প্রদায় বলা হয়। সম্প্রদায়গত মনোভাবের গভীরতার ভিত্তিতে সম্প্রদায় ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হতে পারে। এলাকা ও উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের কারণে সম্প্রদায় বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তার মধ্যে গ্রামীণ সম্প্রদায়, শহুরে সম্প্রদায়, উপজাতীয় সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন সম্প্রদায়ের মানুষ তুলনামূলকভাবে বেশি প্রগতিশীল?

(ক) শহুরে সম্প্রদায় (খ) গ্রামীণ সম্প্রদায়

(গ) ঐতিহ্যবাহী পেশাজীবি সম্প্রদায় (ঘ) উপজাতীয় সম্প্রদায়

২। সম্প্রদায়ের মৌলিক দুটি ভিত্তি কি কি?

(ক) সুনির্দিষ্ট এলাকা ও জনগোষ্ঠী (খ) মানুষ ও সমাজ

(গ) অভিন্ন সংস্কৃতি ও অঞ্চল (ঘ) বসবাসের এলাকা ও সম্প্রদায়গত চেতনা

পাঠ-৪.৩ দল
Group

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- দল বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- দলের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন;
- দলের ধরনগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দল/গোষ্ঠী।

সাধারণ অর্থে দল বলতে বোঝায় যখন কিছু মানুষ নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় এবং তাদের মধ্যে একটি সম্পর্কে তৈরি হয়। দল গঠনের মূলে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্যবিহীন কোনো জনগোষ্ঠীকে দল বলা যায় না। দলের সদস্যদের মধ্যে থাকবে পারস্পরিক নির্ভরতা ও উদ্দেশ্যের অভিন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা। সংগঠিত জীবনযাপন করতে হলে প্রয়োজন দলগত জীবন বা গোষ্ঠী জীবন। পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান, আবেগ ও সংবেদনশীলতা রয়েছে এমন কতিপয় ব্যক্তির সমষ্টিকে গোষ্ঠী বলা হয়। দল হচ্ছে একাধিক ব্যক্তির সমষ্টি যারা একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করে। যথা - পরিবার, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গোষ্ঠীর সংজ্ঞা প্রদান করছেন। যেমন:

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার এবং পেজ বলেন, দল বলতে যেকোনো পরস্পর সম্পর্কিত মানবগোষ্ঠীকে বুঝায়।

সমাজ মনোবিজ্ঞানী শেরিফ (Sherif) এর মতে, দল হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট মর্যাদা ও ভূমিকা সম্পন্ন এমন কিছু লোকের সমষ্টি যাদের আচরণ ও বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করার মত অভিন্ন মূল্যবোধ ও রীতিনীতি রয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট বলেন, সামাজিক গোষ্ঠী হলো পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়াশীল এবং একটি স্বীকৃত কাঠামোর আওতায় জনসমষ্টি।

সমাজবিজ্ঞানী স্মল দলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "দল হচ্ছে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ একটি জনসমষ্টি যার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে এমন একটি সম্পর্ক, যা দলের সদস্যদেরকে একই সূত্রে গ্রোথিত করে।"

সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট মার্টনের মতে, দল হচ্ছে এমন কিছু লোকের সমষ্টি যারা একে অপরের সঙ্গে স্বীকৃত ও নির্দিষ্ট ধারায় মিথস্ক্রিয়ায় রত হয়; যারা মনে করে, তারা একটি দলের অন্তর্ভুক্ত এবং যাদেরকে অন্যরা ভিন্ন দল মনে করে।

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলা যায়, দল হল দুই বা তার অধিক ব্যক্তির সমষ্টি যারা দলে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি, বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে অভিন্ন ধারণা পোষণ করে এবং তাদের সামাজিক ভূমিকা পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ দলের অন্তর্ভুক্ত ব্যাক্তিবর্গের আপন দল সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং যখন কতকগুলি অভিন্ন স্বার্থ তাদেরকে পরিচালিত করবে তখনই তাকে দল বলা যাবে।

দলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Group)

নিম্নে দলের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর হলো-

১। দল হলো সমাজ জীবনের ভিত্তি।

২। দলের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সদস্যের মনেই নিজেকে ও অপরকে আপন দলের একজন সদস্য বলে গণ্য করার মনোভাব থাকবে।।

৩। ব্যক্তিবর্গের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যেই দল গঠিত হয়। উদ্দেশ্যহীন জনসমষ্টিকে দল বলা যায় না।

৪। দল এমন কিছু মানুষের সমষ্টি যাদের মধ্যে সমাজ স্বীকৃত পন্থায় মিথস্ক্রিয়া থাকবে।

৫। দলের সদস্যদের মধ্যে আমরা মনোভাব (we feeling) এর অস্তিত্ব অপরিহার্য।
৬। দল মোটামুটি স্থায়ী ও অবিচ্ছিন্ন।
৭। দলের সদস্যদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা থাকবে।
৮। দলের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে আদর্শগত মিল, আচরণ ও কর্মকান্ডে অভিন্নতা উহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
৯। দলের সদস্যগণের মধ্যে নিজ দলের অখণ্ডতা সম্পর্কে সামগ্রিক চেতনার সৃষ্টি করে
১০। দলবদ্ধ হয়ে জীবন যাপনা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানব জীবনের আদিম পর্যায় থেকেই মানুষ তার সমমনাদের সঙ্গে দল গঠন করে যৌথ জীবন যাপান আরম্ভ করে।

উপরের বৈশিষ্ট্যগুলোকে অনুধাবন করে বলা যায় যে, দল হচ্ছে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এমন কিছু ব্যক্তিসমষ্টি যারা অভিন্ন উদ্দেশ্যে সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ এবং যারা বিধিবদ্ধ নিয়ম শৃংখলা দ্বারা পরিচালিত।

দলের ধরন (Types of Group)

উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে দলের শ্রেণিকরণ করা হয়। সমাজবিজ্ঞানী সামনার তাঁর *Folkways* নামক গ্রন্থে দলকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা:

১। অন্তঃদল (In-group)
২। বহিঃদল (Out-group)

উক্ত দু'ধরনের দলকে 'আমাদের দল' (We group) এবং 'অন্য দল' (Other group) ও বলা হয়ে থাকে। যেমন- যারা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তারা নিজেদেরকে অন্তঃদলের সদস্য এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে বহিঃদলের সদস্য বিবেচনা করতে পারে।

সমাজবিজ্ঞানী কুলী তাঁর *Social Organization* নামক গ্রন্থে দলকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা-

১। মুখ্য দল (Primary group) ও
২। গৌণ দল (Secondary group)

১। মুখ্য দল: মুখ্য দলের সদস্যদের মাঝে থাকবে গভীর সহানুভূতি ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। মুখ্য দলের সদস্যরা নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ। এটাকেই সমাজবিজ্ঞানী কুলী বলেছেন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক (face to face relation)। তিনি কেবল পরিবারকেই মুখ্য দল বলে অভিহিত করেছেন। আর অন্যান্য সকল দলকে তিনি বলেছেন গৌণ দল। তাঁর মতে, রাষ্ট্র একটি গৌণ দল। মুখ্য দলের সদস্যদের মনের মধ্যে 'আমরা মনোভাব' (we feeling) বিদ্যমান থাকে। মুখ্য দল সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র বিন্দু। এই দলের মধ্যেই মানুষ সবচেয়ে বেশী ব্যক্তিগত জীবন যাপন করে থাকে এবং এক্ষেত্রে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

২। গৌণ দল: গৌণ দল হল বৃহত্তর সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত একটি জনসমষ্টি যেখানে একে অপরের সাথে পরোক্ষভাবে সংযোগ রক্ষা করে চলে। এখানে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। গৌণ দল কতকগুলো রীতিনীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হয়, যেমন- ট্রেড ইউনিয়ন, শিক্ষক সমিতি ও ছাত্র সংগঠন ইত্যাদি। গৌণদলে অধিকার ও কর্তব্যবোধ থাকে নির্দিষ্ট। এই দলের সদস্যদের দল সম্বন্ধে সচেতনতা ও ঐক্যবোধ থাকলেও এখানে সবকিছু প্রত্যক্ষ কিংবা ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না। এধরনের দলে আনুষ্ঠানিক তথা সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য থাকে।

মুখ্য দল ও গৌণ দলের মধ্যে পার্থক্য

নিম্নে মুখ্য দল এবং গৌণ দলের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো-

ক্রম	মুখ্য দল	গৌণ দল
১.	মুখ্য দলের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ।	গৌণ দলের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক পরোক্ষ ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ।
২.	আকার-আয়তনের দৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকার।	আকার-আয়তনের দৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার।
৩.	মুখ্য দলের সদস্যরা তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন।	গৌণ দলের সদস্যরা তাদেরঅস্তিত্ব সম্পর্কে তত সচেতন নয়।
৪.	মুখ্য দলের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে বিধিবদ্ধ এবং বিস্তারিত কোন বিধিবিধান পরিলক্ষিত হয় না।	গৌণ দলের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক বিধিবিধান পরিলক্ষিত হয়।
৫.	মুখ্য দলের জন্ম হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ।	সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে গৌণ দল জন্ম লাভ করে।
৬.	ব্যক্তির সামাজিকীকরণে মুখ্য দলের ভূমিকা বেশি।	সামাজিকীকরণে গৌণ দলের ভূমিকা কম।

৭.	মুখ্য দলের সদস্যদের সম্পর্ককে অধিকতর মানবিক ও সামাজিক বলা যায়।	গৌণ দলের সদস্যদের সম্পর্ক যতটা না মানবিক তার চেয়ে এখানে চুক্তিই বড় কথা।
৮.	মুখ্য দল সার্বজনীন।	গৌণ দল সার্বজনীন নয়।
৯.	মুখ্য দলের সদস্যদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা প্রবল।	গৌণ দলের সদস্যদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা দুর্বল।
১০.	মুখ্য দলের সদস্যরা পরস্পরকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করতে পারে।	গৌণ দলের সদস্যরা পরস্পরকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করতে পারে না।
১১.	মুখ্য দল আকারে ছোট।	গৌণ দল আকারে বড়।
১২.	রক্তের সম্পর্ক কিংবা স্নেহ ভালবাসার ভিত্তিতে মুখ্য দল গড়ে উঠে।	গৌণ দল সাধারণত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে উঠে।
১৩.	মুখ্য দলের সদস্যদের মধ্যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অভিন্নতা থাকে।	গৌণ দলের সদস্যদের মধ্যে লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ভিন্নতা বিদ্যমান।
১৪.	মুখ্য দলের সদস্যদের ভেতর দৈহিক নৈকট্য বিদ্যমান।	গৌণ দলের সদস্যদের মধ্যে দৈহিক দুরত্ব বেশি।
১৫.	মুখ্য দলের স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হলেও এর সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক সহজে নষ্ট হয় না।	গৌণ দল কখনও স্থায়িত্ব লাভ করলেও এর সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক খুব বেশি ঘনিষ্ট হয় না।
১৬.	মুখ্য দলের সদস্যদের মধ্যে 'আমরা মনোভাব' প্রবল	গৌণ দলের সদস্যদের মধ্যে 'আমরা মনোভাব' কম।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি সারণিতে মুখ্যদল ও গৌণদলের পার্থক্য লিখুন।	সময়: ১০ মিনিট

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানের প্রত্যয়সমূহের মধ্যে দল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। মানুষ সামাজিক জীব। তাই সে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে চায়। এ জন্যই মানুষ বিভিন্ন দল গঠন করে। দলের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে দলের প্রকারভেদ করতে গিয়ে এক একজন সমাজবিজ্ঞানী এক একটি বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দেওয়ায় দলের শ্রেণিকরণ সবসময় সমরূপ নাই। এজন্য দল বলতে আমরা বুঝি একাধিক ব্যক্তির সমষ্টি যারা একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করে। যথা - পরিবার, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, সঙ্গী দল ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মুখ্য দলের সদস্যদের সচেতনতা কেমন?

(ক) পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অসচেতন (খ) পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন

(গ) সমাজের সকল স্তরের মানুষ সম্পর্কে সচেতন (ঘ) রাজনৈতিকভাবে সচেতন

২। ম্যাকাইভার দল বলতে কী বুঝিয়েছেন?

(ক) জনসমষ্টির পারস্পরিক পারিবারিক সম্পর্ক (খ) জনসমষ্টির পারস্পরিক আর্থ সামাজিক সম্পর্ক

(গ) জনসমষ্টির পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক (ঘ) জনসমষ্টির পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্ক

৩। মুখ্য দলের সদস্য বা একে অন্যের সাথে কী ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখেন ?

(ক) ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ। (খ) পরোক্ষ সম্পর্ক

(গ) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (ঘ) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সম্পর্ক

৪। "মুখ্য দল" বলে সমাজবিজ্ঞানী কুলী কোনটিকে চিহ্নিত করেছেন ?

(ক) রাষ্ট্র (খ) জনতা (গ) জাতিবর্ণ (ঘ) পরিবার

পাঠ-৪.৪ প্রতিষ্ঠান ও সংঘ
Institution and Association

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- প্রতিষ্ঠান ও সংঘ বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- প্রতিষ্ঠান ও সংঘের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- প্রতিষ্ঠানের ধরনগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- সংঘের সাথে প্রতিষ্ঠান ও সমস্প্রদায়ের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রতিষ্ঠান, সংঘ।

প্রতিষ্ঠান (Institution)

সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। সমাজ জীবনের নানাবিধ কর্মকাণ্ড ও জটিলতা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্যই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। তবে প্রতিষ্ঠান শুধু মানুষের প্রয়োজনই পূরণ করে না, মানুষের ক্রিয়াকর্মকেও নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সমাজবদ্ধ মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠিত প্রথাপদ্ধতি, যা পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। প্রতিষ্ঠান বলতে সাধারণত, কতকগুলো প্রতিষ্ঠিত কার্যপ্রণালীকে বুঝায়। সমাজে যদি প্রতিষ্ঠিত কার্যপ্রণালী, রীতি-নীতি না থাকত, তাহলে মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে সমাজে বাস করতে পারত না। কাজেই সমাজে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করতে পারে। তাই বলা যায় প্রতিষ্ঠান হলো সামাজিক কাঠামোর এমন উপাদান যার মাধ্যমে মানুষ প্রয়োজন মিটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম সংগঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও বাস্তবায়ন করে।

সুসংবদ্ধ সমাজ জীবন মানুষের কাম্য। মানুষ তার গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য সমাজে কতগুলো নিয়ম-কানুনের সৃষ্টি করে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠিত নিয়মনীতিকে প্রতিষ্ঠান বলে। কেননা প্রতিষ্ঠিত নিয়মনীতি ভিন্ন সমাজ জীবন কখনো সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে পরিচালিত হতে পারে না। যেমন ঃ 'বিবাহ' নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই 'পরিবার' গড়ে ওঠে। যদি বিবাহের মাধ্যমে পরিবারের সৃষ্টি না হত তাহলে নারী-পুরুষের সমন্বয়ে সুশৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রিত সমাজ গড়ে উঠত না। ফলে সমাজে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।

ম্যাকাইভার ও পেজ তাঁদের '*Society*' নামক গ্রন্থে প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, "প্রতিষ্ঠান হলো সে সব প্রতিষ্ঠিত কর্মপদ্ধতি যার মাধ্যমে গোষ্ঠীর কার্যাবলীর বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়।"
সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট প্রতিষ্ঠান বলতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলো স্থায়ী ও স্বীকৃত কর্মপদ্ধতিকে বুঝিয়েছেন।

সুতরাং প্রতিষ্ঠান হচ্ছে প্রচলিত বিধি-বিধান ও কর্মপন্থা, যা দীর্ঘকাল যাবৎ সমাজে প্রচলিত।

প্রতিষ্ঠানের ধরনসমূহ (Types of Institution)

সমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন:

১। **পারিবারিক প্রতিষ্ঠান:** পরিবার সমাজ জীবনের আদি ও সর্বজন স্বীকৃত একটি সামাজিক দল। বিবাহ ও ব্যক্তি সম্পর্কের ভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রী, পিতা–মাতা, ভাই–বোন, সন্তান-সন্ততিসহ মানুষ যেখানে একত্রে বসবাস করে তাকেই পরিবার বলে। পরিবারের পূর্বশর্ত হলো বিবাহ। পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, কোর্টশিপ উল্লেখযোগ্য।

২। **অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান:** ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, যেসব মৌলিক ব্যবস্থা ও নিয়মকানুন পণ্য উৎপাদান, ভোগ ও বন্টন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে থাকে - তাকেই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে। মানুষ আদিম যুগ থেকেই অর্থনৈতিক

জীবন আরম্ভ করেছে। মানব সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামো পরিবর্তন ঘটেছে। সম্পত্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। তবে আধুনিক কালে ব্যাংক, বীমা, সমবায় ও ঋণদান সংস্থা ইত্যাদিকেও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা যায়। কারণ, সমাজস্থ মানুষের সম্পত্তি ও সম্পদ এসব সংগঠনের মাধ্যমেই সুরক্ষিত ও প্রসার লাভ করে।

৩। **রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান:** রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ তার রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পাদন করে। সমাজের সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকান্ড অধিকাংশই রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। রাষ্ট্র তার বিভিন্ন বাহনের মাধ্যমে সমাজের আইন-শৃংখলা রক্ষা, শাসন ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ, আইন-প্রণয়ন, নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণসহ অনেক দায়িত্ব পালন করে। আধুনিক কালের মতো প্রাচীন গ্রিক নগর রাষ্ট্রে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়নি। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হচ্ছে, সংসদ, ভোট, নির্বাচন প্রভৃতি।

৪। **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান:** ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্ম হল সর্বজনীন ও প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নানাভাবে ধর্মের সংগে সম্পর্কযুক্ত। সমাজবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, কতকগুলো সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। মধ্যযুগে সমাজ ও রাষ্ট্র ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। ধর্মীয় রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, প্রথা-প্রতিষ্ঠান এখনো মানুষের সমাজ জীবনকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মসজিদ, মন্দির, গির্জা, নামাজ, রোজা, উপাসনা, পূজা অর্চনা উল্লেখযোগ্য।

৫। **শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান:** শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত বুদ্ধি, মেধা ও নৈতিক ক্ষমতাগুলোকে বিকশিত করে তার ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলা। শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র চরিত্র গঠন করে। যৌক্তিকতা এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যোগ্য করে তোলে। স্কুল, মাদ্রাস, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লাস, পরীক্ষা, প্রভৃতি হলো শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ।

৬। **সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান:** সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মানুষের সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ও প্রকাশ ঘটে। সমাজ প্রবাহের সঙ্গে মানুষের মধ্যে যে জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধির সৃষ্টি হয় তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য নানাবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেরও উদ্ভব হয়েছে এবং এসব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই মানুষের সৃজনশীল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। সাহিত্য সংঘ, সঙ্গীত পর্ষদ ও নাট্য সংঘ হল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের এক একটি দৃষ্টান্ত।

সংঘ (Association)

কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যখন কিছু লোক ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তাকে সংঘ বলে। সাধারণ অর্থে সংঘ বলতে বুঝায় এমন একটি জনসমষ্টি যারা কোনো বিশেষ কাজ সম্পাদন করার জন্য তৎপর হয়। সমাজে বিভিন্ন ধরনের সংঘ রয়েছে। একাধিক সংঘ একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনো গোষ্ঠী যখন একত্রিত হয় তখন তাকে সংঘ বলে। তাঁরা আরো বলেন, সংঘ হচ্ছে এমন একটি গোষ্ঠী যা অভিন্ন গোষ্ঠী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য গঠিত হয়। এ অর্থে আমরা রাষ্ট্রকে সংঘ বলতে পারি।

জিসবার্টের মতে "সংঘ হলো একটি মুখ্য গোষ্ঠী যা কোন বিশেষ বা কতক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত হয়।" পরিবার ও রাষ্ট্রকে সংঘ হিসাবে বিবেচনা করা যায়। সংঘকে কোনো কর্ম সম্পাদনের বাহনও (agency) বলা যায়। সেক্ষেত্রে সংঘ একটি করপোরেশন সমতুল্য। সমাজ জীবনে মানুষের চাহিদা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিচিত্র ধরনের। একক প্রচেষ্টায় মানুষের পক্ষে তার সব চাহিদা ও লক্ষ্য অর্জন করা অসম্ভব। এই উদ্দেশ্যেই মানুষ সমবেতভাবে এবং সহজে সমাজ জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষগুলোকে বাস্তবায়ন করতে চায়।

সংঘ গঠনের পেছনে দু'টি উপাদান ক্রিয়াশীল, যথা - অভিন্ন উদ্দেশ্য এবং সংগঠিত হওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছা। যেমন, ফুটবল ক্লাব, শিক্ষক সমিতি, বণিক সমিতি ইত্যাদি। সংঘ গঠনের জন্য কতকগুলো মানবীয় উপাদান যুক্ত হয় তা হলো: (ক) একটি বিশেষ উদ্দেশ্য, (খ) সংঘের নাম ও প্রতীক, (গ) কর্তৃপক্ষ, (ঘ) সংঘের আচরণবিধি, (ঙ) সংঘের পদমর্যাদা, (চ) সংঘের সদস্যপদ এবং সংঘের সম্পত্তি।

সংঘের বৈশিষ্ট্য: নিম্নে সংঘের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হলো:

১। সংঘের সদস্যদের উদ্দেশ্য অভিন্ন হতে হয়;

২। সংঘের সদস্য হলে তাকে ঐ সংঘের বিধি বিধান মেনে চলতে হয়;
৩। সংঘ গঠনের উদ্দেশ্য এক বা একাধিক হতে পারে;
৪। সংঘের একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকে;
৫। সদস্যদেরকে সংঘের গঠনতন্ত্র ও নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়;
৬। কোনো সদস্য সংঘের নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এমনকি বহিষ্কার পর্যন্ত করা হয়;
৭। সংঘের সদস্য হওয়া বাধ্যতামুলক নয়;
৮। সংঘের মাধ্যমে মানুষের চাহিদা পূরণের বাস্তব প্রয়াস চালানো হয়;
৯। সংঘের সদস্যদের মধ্যে স্বজাত্যবোধ থাকার প্রয়োজনীয়তা নেই;
১০। বিভিন্ন সংঘ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে (সমাজ কল্যাণ, বিনোদন, রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদি) গঠিত হয়;
১১। সংঘের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য একটি কর্মনির্বাহী পর্ষদ ও গঠনতন্ত্র থাকে;
১২। সংঘ ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, আবার দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে ।

সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য : সংঘ এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

১। মানুষ সংঘের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু চাহিদা ভোগ করে; কিন্তু প্রতিষ্ঠানে সে জন্মগ্রহণ করে।
২। সংঘের সাথে সদস্যপদের প্রশ্ন জড়িত, কিন্তু প্রতিষ্ঠান হলো সামাজিক আচরণের প্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতি।
৩। সংঘ গঠন করতে হয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠান সমাজ জীবনে ক্রমবিকশিত হয়।
৪। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি আপন আগ্রহে সংঘের সদস্য হয়। কিন্তু ব্যক্তি সহজাতপ্রবৃত্তির গুণেই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়।
৫। সংঘ সংগঠিত দল, আর প্রতিষ্ঠান সুনির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের রূপ বিশেষ।
৬। মানুষ সংঘের সদস্য, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সদস্য নয়।
৭। সংঘ বিভিন্ন সদস্যের নির্দেশক, আর প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কার্যপ্রণালীর নির্দেশক।
৮। সংঘ প্রতিষ্ঠান ছাড়া অপর পক্ষে প্রতিষ্ঠান সংঘ ছাড়া সৃষ্টি হয় না।
৯। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘ গড়ে উঠে কিন্তু প্রতিষ্ঠান অনেকটা প্রয়োজনের তাগিদেই স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে।

সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য: আমরা জানি যে, সংঘ হচ্ছে একটি ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টি যা এক বা একাধিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তৎপর এবং কয়েকটি মানবীয় উপাদান থাকে। আর সম্প্রদায় হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী জনসমষ্টি যারা তাদের অভিন্ন জীবন ধারার অংশীদার হয়ে একত্রে বসবাস করে। নিচে সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো:

১। সংঘ কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ও স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে গঠিত হয়, যেমন - ক্রীড়াসংঘ
আর সম্প্রদায় হলো এমন একটি জনগোষ্ঠী যার সদস্যরা বিশেষ কোনো স্বার্থের অনুসারী না হয়ে অভিন্ন জীবনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য একই এলাকায় বসবাস করে।

২। সংঘ কোনো সম্প্রদায় নয়, বরং সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একটি সংগঠন মাত্র। যেমন, একটি গ্রাম বা শহরে অনেকগুলো সংঘ গড়ে উঠতে পারে। তাই বলা হয় সম্প্রদায় ব্যাপক আর সংঘ সীমিত সংগঠন।

৩। যেকোনো ব্যাক্তির সংঘের সদস্য হওয়া স্বেচ্ছামূলক, কিন্তু জন্মগতভাবে ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে যেকোনো ব্যাক্তি সম্প্রদায়ের সদস্য বলে বিবেচিত। একজন ব্যক্তি সংঘের সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে পারে। কিন্তু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সদস্যপদ স্থায়ী।

৪। সম্প্রদায় হচ্ছে একটি স্থায়ী সামাজিক গোষ্ঠী যার উদ্দেশ্য একাধিক বা সামগ্রিক হতে পারে। সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে।
কিন্তু সংঘ ক্ষণস্থায়ী, তার উদ্দেশ্য ও স্বার্থের বাস্তবায়ন না হলে তা নাও টিকতে পারে।

৫। সংঘের সদস্যরা এর নীতি, আদর্শ ও নিয়ম-কানুন মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যরা তাদের অভিন্ন স্বার্থ ও উদ্দেশ্যকে মনে রেখে সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য ও রীতিনীতির মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

৬। সংঘের আইনগত অবস্থান রয়েছে। প্রয়োজনে সংঘের সদস্য বা সদস্যরা সংঘের কার্যক্রম বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

৭। সংঘের কোনো আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। কিন্তু সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করতেই হবে।

৮। একজন ব্যক্তি যুগপৎ অনেকগুলো সংঘের সদস্য হতে পারে, কিন্তু একজন ব্যক্তি একটিমাত্র সম্প্রদায়ভুক্ত।

৯। সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত চেতনা থাকে কিন্তু সংঘের থাকতেও পারে আবার নাও পারে।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে লক্ষ করা যায় যে, সংঘের কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রদায়ের তুলনায় সীমিত। সমাজের আংশিক কার্য সম্পাদনে সংঘ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। অপরপক্ষে, সম্প্রদায় সুনির্দিষ্ট এলাকার জনসমষ্টির অভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট যা সংশ্লিষ্ঠ সমাজকাঠামো ও সামাজ ব্যবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি সারণিতে সংঘ, প্রতিষ্ঠান ও সসম্প্রদায়ের পার্থক্য লিখুন।	**সময়: ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানের প্রাথমিক প্রত্যয়সমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। মানুষ তার গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে সমাজে কতকগুলো রীতিনীতি সৃষ্টি করে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি বা কার্যপ্রণালীকে প্রতিষ্ঠান বলে। প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের সার্বিক কর্ম-নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে এবং সমাজের মানুষকে সর্বদা ক্রিয়াশীল রাখে। সমাজবিজ্ঞানে সংঘও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। একদল লোক যখন এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে মানবীয় উপাদানযোগে সংঘবদ্ধ হয় তখন তাকে সংঘ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য কি কি?

(ক) মেধা ও নৈতিক ক্ষমতার বিকাশ

(খ) সাহিত্য শিল্প কলার চর্চা করা ও এর উৎপত্তি সাধন করা

(গ) জীবনযাপনের নিয়ম কানুন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা

(ঘ) ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন করে

২। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।

(ক) সম্পত্তি (খ) রাষ্ট্র

(গ) পরিবার (ঘ) ধর্ম

৩। কিভাবে সংঘের সদস্য হওয়া যায়?

(ক) অপরের ইচ্ছায়। (খ) আপন ইচ্ছায়।

(গ) জনগণের ইচ্ছায়। (ঘ) প্রচার মাধ্যমের প্রভাবে।

৪। সংঘের কী ধরনের ভিত্তি থাকা উচিত?

(ক) নীতিগত (খ) প্রথাগত

(গ) সম্প্রদায়গত (ঘ) আইনগত

পাঠ-৪.৫ সংস্কৃতি ও সভ্যতা
Culture and Civilization

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সংস্কৃতি ও সভ্যতা বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবেন;
- সংস্কৃতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংস্কতি, সভ্যতা।

সংস্কৃতি (Culture)

আধুনিককালের সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি প্রত্যয় হল সংস্কৃতি। সংস্কৃতি সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। প্রচলিত অর্থে সংস্কৃতি বলতে যা বুঝায় সমাজবিজ্ঞানে তা একইরূপে বোঝানো হয় না। প্রচলিত অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে গান-বাজনা, নাটক, নৃত্য, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি। নৃ-বিজ্ঞানে জীবনধারণের সকল বিষয়ই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে আলোচনা করা হয়। তবে সমাজবিজ্ঞানে সংস্কৃতি বলতে বোঝায় মানব সৃষ্ট যাবতীয় বিষয় যা বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে মানব সমাজে বর্তায়। সংস্কৃতির সংজ্ঞা বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। যেমন:

জিসবার্ট বলেন, মানুষের জীবনে সকল বস্তু ও বস্তুগত আচরণের উপায় এবং পার্থিব ও অপার্থিব স্বার্থ ও সশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের জটিল সমষ্টিকে সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হয়।

রস বলেন, " সংস্কৃতি হচ্ছে অর্জিত আচরণের সমষ্টিগত ধরন যা অনুকরণ কিংবা শিক্ষার মাধ্যমে হয়ে থাকে।"

সংস্কৃতির সংজ্ঞায় ই.বি টাইলর বলেন, "জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার-বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিবোধ, আইনকানুন এবং অনুশীলন ও অভ্যাস যা কোনো এক সমাজের পরিবেশে মানুষ আয়ত্ব করে তাই সে সমাজের সংস্কৃতি।"

তাই বলা যায় যে, মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ডই সংস্কৃতি যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে। সংস্কৃতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তা হলো-

(ক) সংস্কৃতি শিক্ষণের মাধ্যমে হয় (Culture is learned),
(খ) সংস্কৃতি অংশগ্রহণের মাধ্যমে হয় (Culture is shared) এবং
(গ) সংস্কৃতি স্থানান্তরিত হয় (Culture is transmissive)।

সংস্কৃতির দুটি উপাদান রয়েছে। একটি বস্তুগত সংস্কৃতি (Material Culture) এবং অন্যটি অবস্তুগত সংস্কৃতি (Non-Material Culture)। মানুষ প্রতিনিয়ত জীবনযাপনের জন্য যা কিছু ব্যবহার ও তৈরি করে তাই বস্তুগত সংস্কৃতি। ঘরবাড়ি, পোষাক পরিচ্ছদ, গাড়ি, আসবাবপত্র তৈজসপত্র প্রভৃতি হলো বস্তুগত সংস্কৃতি । অন্যদিকে মানুষের ভাবনা, কল্পনা, ধ্যান-ধারণা, ধর্ম, নীতিবোধ প্রভৃতি হচ্ছে তার অবস্তুগত সংস্কৃতি।

সভ্যতা (Civilization)

সাধারণ অর্থে সভ্যতা হলো উন্নত জীবনধারা। এ প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার এবং পেজ এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তারা বলেন, আমরা যা তা হলো সংস্কৃতি এবং আমরা যা ব্যবহার করি তা হলো সভ্যতা।

জেরি এবং জেরি বলেন, "সভ্যতা হচ্ছে সংস্কৃতির উন্নত ধরন যেমন- কেন্দ্রীয় সরকার, শিল্পকলা ও শিক্ষণের উন্নয়ন, নীতি-নৈতিকতার সমন্বিত রূপ যা নগরের সাথে সম্পর্কিত এবং বৃহত্তর সমাজ যার মধ্যে নির্দিষ্ট।"

স্কট বলেন, "সভ্যতা হচ্ছে একটি উচ্চতর জটিল বিষয় যা সংস্কৃতির সাথে আপেক্ষিকতার আলোকে তুলনা করা হয়।"

বটোমোর বলেন, "সভ্যতা হলো কতকগুলো নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীর অভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহের সমন্বয়"।

সব মিলিয়ে বলা যায়, সভ্যতা হলো সংস্কৃতির অধিকতর অগ্রসর ও জটিল বিষয় যা বিভিন্ন সমাজে স্পষ্টতই দৃশ্যমান।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ। যথা-

সংস্কৃতি	সভ্যতা
১। সংস্কৃতি হলো মানুষ যা কিছু করে।	১। সভ্যতা হলো মানুষ যা ব্যবহার করে।
২। সংস্কৃতি মানুষের ভেতরের রূপ।	২। সভ্যতা হলো মানুষের বাহ্যিক আচরণ
৩। সংস্কৃতি পরিমাপের মানদন্ড নাই।	৩। সভ্যতা পরিমাপের মানদন্ড রয়েছে।
৪। সংস্কৃতি ধীর গতিতে এগিয়ে চলে।	৪। সভ্যতা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে।
৫। সংস্কৃতির চাহিদা এবং আবেদন তুলনামুলকভাবে কম।	৫। সভ্যতার চাহিদা এবং আবেদন বেশি।
৬। সংস্কৃতি ধ্বংস হয় না।	৬। সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
৭। সংস্কৃতি মানুষের জীবন প্রণালী।	৭। সংস্কৃতির প্রতিফলনই হলো সভ্যতা।
৮। সংস্কৃতির মাপকাঠিতে অগ্রসর বিবেচিত হতে হলে দেখতে হবে মানুষের মনের উৎকর্ষ।	৮। সভ্যতার মাপকাঠিতে মানুষ অগ্রসর বিবেচিত হতে পারে।
৯। জীবনযাপনের সকল পদ্ধতি বা কলাকৌশলই সংস্কৃতি।	৯। উন্নত কলা-কৌশল বা প্রযুক্তি কেবল সভ্যতা।
১০। সংস্কৃতি মানুষের নৈতিক, পারমাঙ্গিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় বোঝায়।	১০। সভ্যতা প্রযুক্তিবিদ্যা, বস্তুগত সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সমষ্টিকে বোঝায়।
১১। সংস্কৃতির গুণমান ও উপযোগিতা যাচাই করা যায় না।	১১। সভ্যতার গুণমান ও উপযোগিতা যাচাই করা যায়।
১২। সংস্কৃতি হলো অন্তঃস্থ ও আঙ্গিক	১২। সভ্যতা হলো বাহ্যিক ও যান্ত্রিক।

সংস্কৃতির গুরুত্ব

ব্যক্তি তথা সমাজজীবনে সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই মানব সমাজে সংস্কৃতির গুরুত্ব দুটি দিক থেকে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত: ব্যক্তি-জীবনে, দ্বিতীয়ত: গোষ্ঠী জীবনে।

ব্যক্তির সামাজিক জীবনে সংস্কৃতির গুরুত্ব রয়েছে। সে কারণে ব্যক্তিগত জীবনে সংস্কৃতির মূল্য অপরিসীম। প্রতিটি সমাজেরই নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে। সে অনুযায়ী সমাজ প্রত্যাশিত আচরণ প্রতিটি ব্যক্তিকেই করতে হয়। তাছাড়া সামাজিক ক্ষেত্রে নানাবিধ জটিল অবস্থার সমাধান সংস্কৃতির মাধ্যমে পাওয়া যায়। সমাজ জীবনে ব্যক্তিকে কোথায়, কী অবস্থায়, কখন, কী করতে হবে বা কী করতে হবে না তা ব্যক্তি জানতে পারে সংস্কৃতির মাধ্যমে। এসবের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করতে পারে। সংস্কৃতি মানুষকে সামাজিক জীবে পরিণত করে। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করার গুণাবলী সংস্কৃতি থেকেই শিক্ষালাভ করে সংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় গোষ্ঠীগত জীবনেও সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসিম। গোষ্ঠীর সদস্যদের সবার মধ্যে 'আমরা বোধ' সৃষ্টি করে। সংস্কৃতির মাধ্যমে গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়। সংস্কৃতির প্রভাবেই মানুষের মনে এমন ধারণার জন্ম হয়। সংস্কৃতি সামাজিক শক্তি হিসেবে কাজ করে। সংস্কৃতির মাধ্যমে গোষ্ঠী জীবনের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। গোষ্ঠী জীবনে ব্যক্তির আচার আচরণকে সংস্কৃতি যুক্তি সঙ্গত ও দাযিত্বশীল করে তোলে। তাই বলা যায় সংস্কৃতি ছাড়া গোষ্ঠী জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব। কারণ সংস্কৃতি সমাজকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনি সংস্কৃতিকে যুগ যুগ ধরে বাচিয়ে রাখে সমাজ।

	শিক্ষার্থীর কাজ	সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি তুলনামূলক সারণি অঙ্কন করুন।	**সময়: ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানের প্রাথমিক প্রত্যয়সমূহের মধ্যে সংস্কৃতি ও সভ্যতা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। মানুষ যা কিছু করে তাই তার সংস্কৃতি যা বংশপরম্পরায় পালন করে। সমাজবিজ্ঞানে মানুষের সংস্কৃতি গুরুত্বসহকারে অধ্যয়ন করা হয়। সংস্কৃতি শিখণের ফল। সংস্কৃতির দুইটি উপাদানের মাধ্যমে সমাজের বস্তুগত এবং অবস্তুগত যাবতীয় বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়। সভ্যতা হলো উন্নত জীবনধারা তথা সংস্কৃতির উন্নত ধরন। সভ্যতা প্রযুক্তিবিদ্যা, বস্তুগত সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সমষ্টিকে বোঝায়। সভ্যতা হচ্ছে সংস্কৃতির অধিকতর অগ্রসর ও জটিল বিষয় যা বিভিন্ন সমাজে প্রবাহিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সংস্কৃতির দুইটি উপাদান কি কি?

(ক) মেধা ও নৈতিক (খ) শিল্প কলা ও সংঙ্গীত

(গ) বস্তুগত ও অবস্তুগত (ঘ) উন্নয়ন ও প্রগতি

২। সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?

(ক) সংস্কৃতি শিক্ষণের মাধ্যমে হয় (খ) সংস্কৃতি প্রচার করে

(গ) সংস্কৃতি অপার্থিব (ঘ) সংস্কৃতি অবাস্তব

৩। সভ্যতা কী?

(ক) গ্রামীণ জীবন (খ) উন্নত জীবনধারা

(গ) লোক-রীতি। (ঘ) গান-বাজনা

পাঠ-৪.৬ সমাজ কাঠামো
Social Structure

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজ কাঠামো বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- সমাজ কাঠামোর উপাদানসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সমাজ কাঠামো, সমাজ কাঠামোর উপাদান।

সমাজ কাঠামো (Social Structure)

সমাজ কাঠামোকে সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় বলা হয়। মানব সমাজ সম্পর্কিত আলোচনায় সমাজ কাঠামো প্রত্যয়টির ব্যবহার শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে। সমাজকে পরিপূর্ণভাবে জানতে হলে তার কাঠামোগত দিক থেকেই জানা সম্ভব। সে কারণেই সমাজ কাঠামোর তাৎপর্য রয়েছে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন:

র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন বলেন, "মানুষের সাথে মানুষের সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক হলো সমাজ কাঠামো।"
এস.এফ.ন্যাডেল বলেন, "সমাজে বসবাসরত মানুষ, ব্যক্তি হিসেবে যে ভূমিকা পালন করে তা এক ধরন তথা ব্যবস্থার অস্তিত্ব নির্দেশ করে এবং এর মাধ্যমে আচরণের যে ধরন বা ব্যবস্থা লক্ষ করা যায় তাই হলো সমাজ কাঠামো।
কার্ল মার্কস এর মতে, সমাজ কাঠামো হলো মৌল কাঠামো এবং উপরিকাঠামোর একীভূত রূপ। তিনি মৌল কাঠামো বলতে অর্থব্যবস্থা তথা উৎপাদন পদ্ধতিকে বুঝিয়েছেন। অপরপক্ষে উপরিকাঠামো বলতে সংস্কৃতিকে বুঝিয়েছেন। নিচে ছক-চিত্রের সাহায্যে মার্কসীয় সমাজ কাঠামোর ধারণা তুলে ধরা হলো:

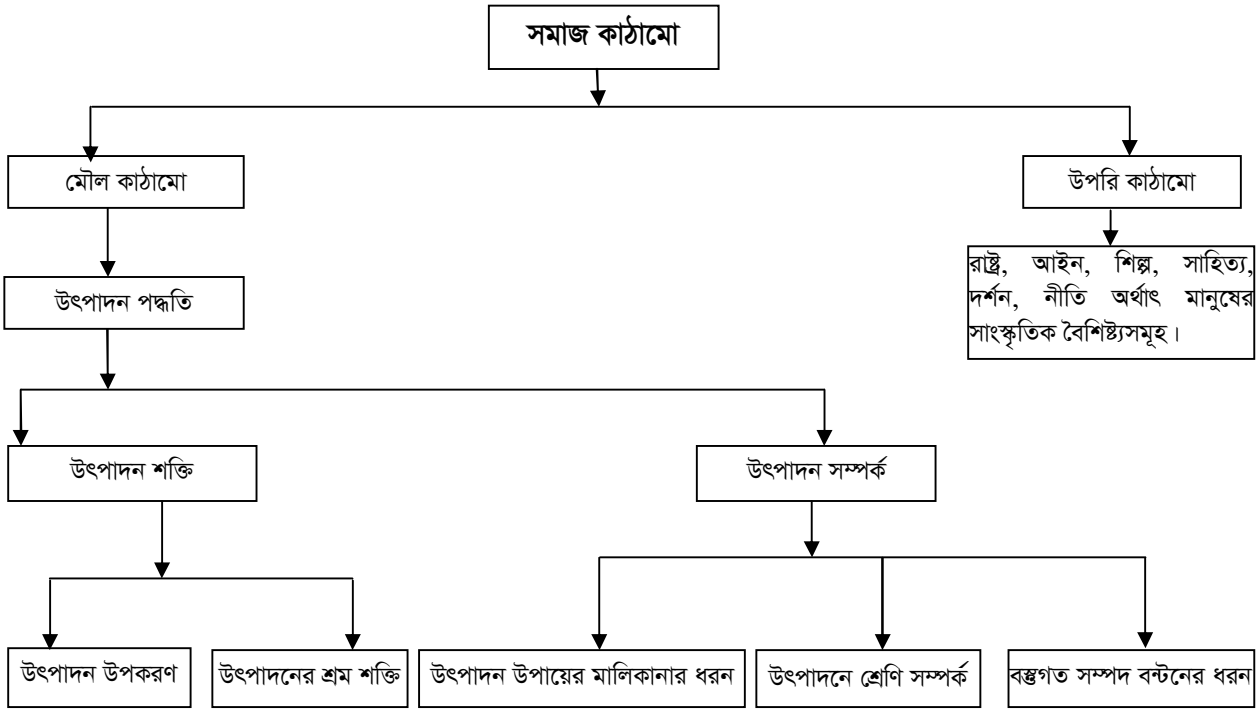

চিত্র ৪.১: সমাজ কাঠামো

সমাজবিজ্ঞানী মরিস জিনসবার্গ বলেছেন, সমাজ কাঠামো হচ্ছে সমাজের প্রধান প্রধান দল এবং প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়। সমাজবিজ্ঞানী বটোমোরও সমাজ কাঠামোকে সমাজের প্রধান দল ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বিত রূপ বলে অভিহিত করেছেন। এসব দল ও প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করতে তিনি সমাজের কতগুলো পূর্বশর্তের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হল:

(ক) ভাব আদান প্রদানের জন্য সমাজের সদস্যদের মধ্যে একটি যোগাযোগ মাধ্যম,
(খ) একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা পণ্য উৎপাদন ও বন্টন নিশ্চিত করে,
(গ) নতুন বংশধরদের জন্য পরিবার ও অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজীকীকরণ ব্যবস্থা,
(ঘ) একটি কর্তৃত্ব ব্যবস্থা ও ক্ষমতার বিন্যাস এবং
(ঙ) ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান প্রক্রিয়া যা সমাজের সংহতি বৃদ্ধি করে।

প্রতিটি সমাজের প্রধান প্রধান দল ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সমস্ত প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে যার মাধ্যমে সমাজকাঠামোর পূর্ণাঙ্গ রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। তবে সমাজকাঠামোর প্রকৃত চিত্র পাবার জন্য কার্ল মার্কসের মৌল কাঠামো ও উপরি কাঠামোর ধারণাকে যুক্ত করা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায় যে, যেকোনো সমাজকে যথাযথ ভাবে অনুধাবণের জন্য সেই সমাজের সমাজকাঠামো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। কারণ সমাজের সঠিক ও সামগ্রিক প্রকাশ ঘটে সমাজ কাঠামোর মাধ্যমেই।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজ কাঠামোর উপাদানগুলো চিহ্নিত করুন।	**সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হলো সমাজ কাঠামো। সমাজ কাঠামোর মাধ্যমে সমাজের সার্বিক আবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। সমাজের প্রধান প্রধান দল ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়েই সমাজ কাঠামো তৈরি হয়। সমাজের চালিকা শক্তি হিসেবে মৌল কাঠামো তথা উৎপাদন পদ্ধতি কিভাবে উপরি কাঠামো তথা সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে তা অনুধাবন করতে সমাজ কাঠামোর অধ্যয়ন অত্যন্ত কার্যকর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "সমাজ কাঠামো হলো প্রধান প্রধান দল ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়"- কে বলেছেন?
(ক) জিনস্‌বার্গ (খ) বটোমোর
(গ) মার্কস্ (ঘ) কুলি

২। কার্ল মার্কস সমাজ কাঠামোর কোন ধারণা দেন?
(ক) সমাজ ও সম্প্রদায় (খ) বস্তুগত ও অবস্তুগত
(গ) মৌল ও উপরি কাঠামো (ঘ) সভ্যতা ও সংস্কৃতি

৩। সমাজ কাঠামো সমাজবিজ্ঞানের কোন প্রত্যয়?
(ক) মাধ্যমিক প্রত্যয় (খ) গৌণ প্রত্যয়
(গ) গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় (ঘ) কেন্দ্রীয় প্রত্যয়

পাঠ-৪.৭ প্রথা, লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতি
Custom, Folkways and Mores

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- প্রথা, লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতি বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতির বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন;
- লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রথা, লোকাচার, অবশ্য পালনীয় লোকরীতি।

প্রথা (Custom)

মানব সমাজে প্রথার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো সুষ্ঠু ও সর্বজনগ্রাহ্য ধারণা লাভ করা যায় না। অনেকের অভিমত, সমাজে কোন কাজ পবিত্র তাই তা করণীয় কিংবা কোন কাজ অপবিত্র তাই নিষিদ্ধ, মানুষের এই উপলব্ধি থেকেই প্রথার সৃষ্টি। যখন সমাজ সহজ-সরল এবং জটিলতামুক্ত ছিল তখন সামাজিক প্রথার মাধ্যমে সমাজ শাসিত হতো। বংশ পরম্পরায় চলে আসা অনুশাসনের মাধ্যমেই সমাজ পরিচালিত হত। সামাজিক প্রথা ঐতিহ্যবাহী হওয়ায় সাধারণ মানুষের নিকট এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সামাজিক অনুষ্ঠানাদি কিভাবে সম্পন্ন হবে তা প্রথা দিয়েই নির্ধারিত হত। সমাজ সহজ সরল ও জটিলতা মুক্ত হওয়ার প্রত্যক ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান করা হতো সামাজিক প্রথার মাধ্যমে। তাই বলা হয় সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সমাজ অনুশাসনই হলো প্রথা। প্রথার সংজ্ঞা বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন-

অগবার্ন ও নিমকফ বলেন, "প্রথা হলো সেই সকল সামাজিক কার্যাবলি যা সমাজ অনুমোদিত এবং যার পৌনঃপুনিকতা আছে। "

ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, "প্রথা হলো মানুষের আচরণবিধি বা রীতিনীতির জটিল সমষ্টি।"
জিসবার্ট প্রথার প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তা হলো- (ক) আচরণের ধারাবাহিকতা, (খ) সামাজিক প্রকৃতি এবং (গ) আদর্শগত মূল্যমান।

তাই বলা যায় যে, সমাজস্থ মানুষ প্রতিনিয়ত কতকগুলো নির্দিষ্ট রীতিনীতি বা বিধিবিধান মোতাবেক যেসব আচরণ করে যা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত এবং বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। এসব রীতিনীতি বা বিধি বিধানই হলো প্রথা।

প্রথার সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। কারণ প্রথার একটি ঐতিহ্য রয়েছে এবং তা চিরায়ত রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া সব সমাজেই প্রথা কম-বেশি বর্তমান। প্রথার সঙ্গে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ জড়িত এবং প্রথা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে। প্রথা মানব সমাজের সাংগঠনিক কাঠামোকে অটুট রাখে। প্রথা কেবল মানুষের বাহ্যিক আচরণের উপর নয়, মনোজগতেও প্রভাব বিস্তার করে। পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল সম্প্রদায়ে প্রথার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। অনেক দেশ রয়েছে যেখানে প্রচলিত সামাজিক প্রথাগুলিকে অমান্য করার বিষয়ে ঐ দেশের মানুষ ভাবতেও পারে না। মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনেও প্রথার ভূমিকা রয়েছে।

লোকাচার (Folkways)

সমাজ সম্পর্কিত আলোচনায় একটি বহুলব্যবহৃত এবং প্রচলিত ধারণা হলো লোকাচার। সমাজবিজ্ঞানী সামনারের মাধ্যমে 'লোকাচার' শব্দটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। মানুষের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। যেমন- খাদ্য গ্রহণ, বাসস্থান, বিবাহ, পোশাক-পরিচ্ছেদ প্রভৃতি যা নানামুখী আচারণের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এ অভ্যাস এবং আচরণ বংশানুক্রমে চলতে থাকে। আর এভাবেই গড়ে ওঠে একটি সমাজের লোকাচার। তাই বলা হয় লোকাচার হলো সমাজস্থ

মানুষের আচরণের জন্য স্বীকৃত ও গৃহীত প্রন্থা যা পালন না করলে শস্তির কোন বিধান নাই তবে তাদের প্রতি নিন্দা বা ঘৃণা প্রকাশ করা হয়। যেকোনো সমাজের ঐতিহ্য, চালচলন, পোশাক পরিচ্ছেদ, আদব-কায়দা, রীতিনীতি কেউ পালন না করলে শাস্তি দেওয়া হয় না তবে তাদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করা হয়। লোকাচারের সংজ্ঞা বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। যেমন:

ম্যাকাইভার এবং পেজ বলেন, "সমাজে সৃষ্ট ও স্বীকৃত এবং গৃহীত পন্থাই হলো লোকাচার।"
সামনারের মতে, "লোকাচার হচ্ছে গণভিত্তিক ঘটনা, সাদৃশ্যের প্রবাহ, তাদের সংগঠন ও পারস্পরিক অবদান।"
অগবার্ন ও নিমকফ এর মতে " আদিম সমাজের কতিপয় নির্দিষ্ট অপ্রধান বা কম গুরুত্বপূর্ণ প্রথাকে লোকাচার বলে।"
জিসবার্ট বলেন, "লোকাচার স্বতঃস্ফুর্ত। প্রতিষ্ঠান বা প্রথা অপেক্ষা লোকাচারের অর্থ বিস্তৃত। বর্তমান সমাজে বৈজ্ঞানিক ধারণার বাহিরে যাবতীয় স্বতঃস্ফুর্ত আচরণ ও ব্যবহারবিধি সবই লোকাচারের অন্তর্গত।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, লোকাচার হলো সমাজস্বীকৃত আচরণ যা পালনে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দৃঢ় হয় এবং পালনে ব্যর্থ হলে কাউকে শাস্তি পেতে হয় না। তবে এমন আচরণ সমাজ প্রত্যাশাও করে না।

লোকাচারের বৈশিষ্ট্যঃ লোকাচারের কতিপয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন:
(ক) লোকাচার সামাজিক নিন্ত্রণের বাহন হিসেবে কাজ করে ।
(খ) লোকাচার পালনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সমাজের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়।
(গ) লোকাচারে সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হতে হয়।
(ঘ) সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে স্বত:স্ফুর্তভাবে লোকাচার সৃষ্টি হয়।
(ঙ) সমাজস্থ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে লোকাচারের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য লক্ষ করা যায়।
(চ) লোকাচার মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়।
(ছ) সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে লোকাচার রীতিতেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তবে তা দ্রুত পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন হয় ধীর গতিতে।

লোকাচারের গুরুত্ব : লোকাচার সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উল্লেখযোগ্য বাহন হিসেবে কাজ করে। লোকাচারের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল, স্থিতিশীল, আনন্দঘন জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। লোকাচারের মাধ্যমে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আচার-আচরণের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়। গ্রামীণ এলাকায় লোকাচারের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রামীণ জীবন সহজ-সরল হওয়ায় বংশ পরম্পরায় লোকাচার পালন হয়ে আসছে। লোকাচার একটি শক্তিশালী সামাজিক মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে। তাছাড়া যেকোনো সমাজের লোকাচার ঐ সমাজের সামাজিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে কাজ করে।

অবশ্য পালনীয় লোকরীতি (Mores)

অবশ্য পালনীয় লোকরীতি হলো সামাজিক আদর্শ বা মানসম্পন্ন আচরণ যা সমাজের সদস্যদের জন্য পালন করা বাধ্যতামূলক। এধরনের আদর্শ আচরণনীতি কেউ পালন না করলে শাস্তির বিধান রয়েছে এবং শাস্তি পেতে হয়। আদিম সমাজে যেমন অলিখিত বিধিবিধান ছিল তেমনি আধুনিক সমাজে বিভিন্ন আইন কানুন রয়েছে যা আবশ্যিক পালনীয় লোকরীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জিসবার্টের মতে, " অবশ্য পালনীয় লোকরীতি হলো ব্যবহারবিধি নিয়ন্ত্রণকারী লোকাচার।"
ম্যাকাইভার এবং পেজের মতে, " অবশ্য পালনীয় লোকরীতি হলো ব্যবহার নিয়ন্ত্রক।"
সামনার বলেন, "অবশ্য পালনীয় লোকরীতি হচ্ছে আবশ্যিক পালনীয় লোকাচার।"
মিশেল বলেন, "অবশ্য পালনীয় লোকরীতি হলো মানুষের আচরণের ধরন যা কেবল স্বীকৃত ও ঐতিহ্যবাহী নয় তা নির্ধারিতও বটে।"

উপরের সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, অবশ্য পালনীয় লোকরীতি হলো সমাজস্থ মানুষের আবশ্যক পালনীয় আচরণ যা পালনে ব্যার্থ হলে শাস্তি পেতে হয়।

অবশ্য পালনীয় লোকরীতির বৈশিষ্ট্য: অবশ্য পালনীয় লোকরীতির কতিপয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তা হলো:
(ক) অবশ্য পালনীয় লোকরীতি সমাজের কিছু বিধি-বিধান যা লোকাচারের তুলনায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়;
(খ) কেউ এ বিধি-বিধান পালন না করলে সমাজ চাপ সৃষ্টি করে;

(গ) লোকরীতি পালনে সমাজ চাপ সৃষ্টি করে ব্যর্থ হলে শাস্তি প্রদান করে;
(ঘ) অবশ্য পালনীয় লোকরীতির আচরণ সমাজের ভালো-মন্দ বা কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কিত;
(ঙ) সামাজিক নিন্ত্রণের ধারণা অবশ্য পালনীয় লোকরীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে;
(চ) দেশ কাল ভেদে অবশ্য পালনীয় লোকরীতির তারতম্য লক্ষ করা যায়।

অবশ্য পালনীয় লোকরীতির গুরুত্বঃ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ মানুষের দলগত জীবনে অবশ্য পালনীয় লোকরীতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ জীবনে অবশ্য পালনীয় লোকরীতি নানাভাবে ভূমিকা পালন করে। সমাজের মানুষের আচার আচরণ এবং কাজ কর্ম অবশ্য পালনীয় লোকরীতি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয়। সমাজের সংহতি রক্ষা করে এবং নানাবিধ ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করে দেয়। অবশ্য পালনীয় লোকরীতি সামাজিক নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা পালন করে। অবশ্য পালনীয় লোকরীতি পালনের মাধ্যমে সমাজের মানুষের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সামাজিক একাত্মবোধ সৃষ্টি হয়।

লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতির মধ্যে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো-

লোকাচার	অবশ্য পালনীয় লোকরীতি
১। লোকাচারের সঙ্গে সমাজের ন্যায়-অন্যায় ও ভালো- মন্দ ধারণা যুক্ত নয়।	১। অবশ্য পালনীয় লোকরীতির সঙ্গে সমাজের ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের ধারণা যুক্ত।
২। অতীতের লোকরীতি বর্তমানের লোকাচারে পরিণত হয়।	২। অবশ্য পালনীয় লোকরীতির ক্ষেত্রে এমন ধারণা কম লক্ষ করা যায়।
৩। লোকাচার অধিক ব্যাপক ও সাধারণ প্রকৃতির।	৩। অবশ্য পালনীয় লোকরীতির পরিধি লোকাচারের ন্যায় বিস্তৃত নয়।
৪। লোকাচার অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী প্রকৃতির।	৪। অবশ্য পালনীয় লোকরীতি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী প্রকৃতির।
৫। লোকাচার পালনে চাপ প্রয়োগ করা হয় না।	৫। অবশ্য পালনীয় লোকরীতি পালনে চাপ প্রয়োগ করা হয়।
৬। লোকাচার পালনে ব্যর্থ হলে শাস্তি পেতে হয় না।	৬। লোকরীতি পালনে ব্যর্থ হলে শাস্তি পেতে হয়।
৭। লোকাচার লঙ্ঘিত হলে তাকে সামাজিক সমস্যা বিবেচনা করা হয় না।	৭। অবশ্য পালনীয় লোকরীতি লঙ্ঘিত হলে তাকে সামাজিক সমস্যা বিবেচনা করা হয়।
৮। লোকাচার আবশ্যিক পালনীয় নয়।	৮। অবশ্য পালনীয় লোকরীতি আবশ্যিক পালনীয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজে লোকচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতির গুরুত্ব লিপিবদ্ধ করুন। সময়: ৫ মিনিট

সারসংক্ষেপ

মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সামাজিক অনুশাসনই হলো প্রথা। অর্থাৎ সমাজস্থ মানুষ প্রতিনিয়ত কতকগুলো নির্দিষ্ট রীতিনীতি বা বিধিবিধান মেনে তার আচরণ করে থাকে যা সমাজকর্তৃক স্বীকৃত এবং বংশ পরমপরায় পালন করে আসছে। এসব রীতিনীতি বা বিধি বিধানই হলো প্রথা। প্রথার সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। কারণ প্রথার একটি ঐতিহ্য রয়েছে এবং তা চিরায়ত রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত। লোকাচার হলো সমাজস্বীকৃত আচরণ যা পালনে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দৃঢ় হয় এবং পালনে ব্যর্থ হলে কাউকে শাস্তি পেতে হয় না। তবে এমন আচরণ সমাজ প্রত্যাশাও করে না। লোকাচারের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল, স্থিতিশীল, আনন্দঘন জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। অবশ্য পালনীয় লোকরীতি হলো সমাজস্থ মানুষের আবশ্যকীয়ভাবে পালনীয় আচরণ যা পালনে ব্যার্থ হলে শাস্তি পেতে হয়। সমাজের মানুষের আচার আচরণ এবং কাজ-কর্ম অবশ্য পালনীয় লোকরীতি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রথা কী?

(ক) নৈতিক ক্ষমতার বিকাশ (খ) প্রথা হলো মানুষের আচরণবিধি

(গ) জীবনযাপনের নিয়ম (ঘ) মানুষের মানসিক বিকাশ সাধন

২। লোকাচার পালন না করলে কী হয়?

(ক) শাস্তি পেতে হয় (খ) শাস্তি পেতে হয় না

(গ) উৎসাহিত করা হয় (ঘ) শাস্তি পেতে হয় না তবে নিন্দিত হতে হয়

৩। লোকরীতি হলো-

(ক) ব্যবহার নিয়ন্ত্রক (খ) ব্যক্তিত্ব বিকাশ

(গ) শিক্ষার বিকাশ (ঘ) সংস্কৃতির উন্নয়ন

ইউনিট-৪ এর উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৪.১	ঃ	১। গ	২। খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৪.২	ঃ	১। ক	২। ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৪.৩	ঃ	১। খ	২। গ	৩। ক	৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৪.৪	ঃ	১। ঘ	২। গ	৩। খ	৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৪.৫	ঃ	১। গ	২। ক	৩। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৪.৬	ঃ	১। ক	২। গ	৩। ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ- ৪.৭	ঃ	১। খ	২। ঘ	৩। ক	
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	ঃ	১। ঘ	২। ক	৩। ঘ	৪। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১. গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মূল বৈশিষ্ট্য কী?

ক. কৃষিভিত্তিক পেশা খ. নিবিড় জ্ঞাতি সম্পর্ক

গ. দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘ. 'ক' এবং 'খ' উভয়

২. সমাজের উপরি কাঠামোর উপাদান হচ্ছে–

ক. আইন, রাষ্ট্র, প্রথা, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন খ. উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন ও মালিকানা

গ. 'ক' এবং 'খ' উভয় ঘ. কোনোটি নয়

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩. সমাজ গঠনের প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত-

i. নির্ভরশীলতা

ii. মিথষ্ক্রিয়া

iii. সামাজিক সম্পর্ক

সঠিক উত্তর কোনটি?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪. অবশ্য পালনীয় লোকরীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?

i. লোকরীতি পালনে সমাজ চাপ সৃষ্টি করে ব্যর্থ হলে শাস্তি প্রদান করে

ii. সমাজের ভালো-মন্দের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই

iii. দেশ-কাল ভেদে অবশ্য পালনীয় লোকরীতির তারতম্য লক্ষ করা যায়

সঠিক উত্তর কোনটি?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন

আরিফ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে পড়ে। সে তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার বিলসা গ্রামে বেড়াতে যায়। গ্রামটি চলনবিলের মধ্যে অবস্থিত। আরিফ তার বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে গিয়ে লক্ষ করে, একটি পাড়ায় কেউ জাল বুনছে, কেউ নৌকা পরিষ্কার করছে, কেউবা আবার মাছ রাখার পাত্র নৌকায় তুলছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের অভিন্ন জীবনধারার ধারণা পায় আরিফ। তবে সমাজের অপরাপর মানুষের সঙ্গেও তারা সুসম্পর্ক বজায় রেখে বংশ পরম্পরায় মাছ শিকার করে আসছে।

(ক) সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় কোনটি? ১

(খ) সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? ২

(গ) গ্রামীণ ও নগর সম্প্রদায়ের তুলনামূলক আলোচনা করুন। ৩

(ঘ) সমাজ ও সম্প্রদায়ের পার্থক্য নিরুপন করুন? ৪